৮.৪ বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (Nature and Characteristics of Globalization)

একটিমাত্র বিষয় প্রাথমিকভাবে আলোচনা করলেই বিশ্বায়নের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিশ্বায়ন জাতি-রাষ্ট্রকে উত্তরোত্তর গুরুত্বহীন করে তুলছে। অন্যভাবে বললে সমসাময়িক পৃথিবীতে বিশ্বায়নের দুর্বার জোয়ারকে মেনে নেওয়া ছাড়া জাতি-রাষ্ট্রের সামনে অন্য কোনো বিকল্প নেই, এমনই শক্তিসঞ্চয় করেছে বিশ্বায়ন। বিশ্ববাজার ও আন্তর্জাতিক আর্থ ব্যবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ ভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সামনে আজ বিকল্প পথ নেই। দীপক নায়ার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে অর্থনৈতিক ভুবনীকরণ আজ সেই ক্ষমতা অর্জন করেছে যার ভিত্তিতে সে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত। তাঁর নিজের কথায়, 'Economic globalisation challenges the political authority, which the nation-state had attained by undermining gradually many of the norms of traditional civil society'.[৬] বাজারকেন্দ্রিক এই বিশ্বায়িত

বিশ্বে চূড়ান্ত নির্ণায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে চারটি 'I' এবং সেগুলি হল যথাক্রমে Industry (শিল্প), Investment (বিনিয়োগ), I.T (Information Technology অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তি) এবং Individualism (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ)। বলাবাহুল্য, আমেরিকাসহ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এই ধারণার নিবিড় অনুসারি। এই মতের অন্যতম প্রবক্তা কেনিচি ওমে বিশ্বায়নের বাধাহীন প্রসারে চারটি I-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন কীভাবে এই পরিবর্তনের সূত্র ধরে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত জাতি-রাষ্ট্রের (nation-state) পরিচিত কাঠামো ভেঙে পড়ছে এবং তার জায়গা দখল করতে চলেছে বাজার অর্থনীতির দ্বারা পুষ্ট 'micro region-states' বা অণু অঞ্চলসমূহ। আগামী দিনে এগুলিই এক একটি মুক্তবাণিজ্য এলাকার রূপ ধারণ করবে। যাইহোক, বিশ্বায়নের এই প্রকৃতি বিশ্লেষণ সম্পূর্ণতা পেতে পারে এই ব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হলে। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ ইত্যাদি পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও বিশ্বায়ন প্রধানত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সুনির্দিষ্টভাবে বললে একগুচ্ছ আর্থ-বাণিজ্যিক নীতির সমাহার। সোভিয়েত-উত্তর পৃথিবীতে বিশ্বায়নের অর্থ হল বিশ্ববাজারের চাহিদা মেনে অর্থনীতির উন্মুক্তকরণ যেখানে পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও বিপণনে কোনো বাধা থাকবে না এবং পাশাপাশি পুঁজির চলাচল হবে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। এই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিচালকের ভূমিকায় থাকবে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির পাশাপাশি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র মতো অধি-রাষ্ট্রিক সংগঠনসমূহ।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বের অর্থনৈতিক সংহতিসাধনের নামে দেশে দেশে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমান্তকে অস্বীকার করা। বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রকরা 'সীমানা' (border) নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয় এবং পুঁজির বাধাহীন চলাচলের জন্যেই তাদের এই সীমানা-বিরোধিতা। বিশ্বায়নের প্রবক্তা ও সমর্থকরা সীমানাবিহীন বিশ্বের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন যে বিশ্বব্যাপী বাজারের সম্প্রসারণ, বহুজাতিক উৎপাদন-বিপণন ব্যবস্থার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি এবং সর্বোপরি, তথ্যপ্রযুক্তির সীমাহীন বিস্তার বিশ্বকে যথার্থই একটি ভুবন-গ্রাম (global village)-এ পরিণত করেছে। তাঁদের মতে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিকীকরণ (internationalization)-ই যথেষ্ট নয়, ভূগোলের প্রাচীর ভেঙে জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা লঙ্ঘন করে দুনিয়াকে প্রকৃত অর্থে 'global' চরিত্র অর্জন করতে হবে। এর ফলে জাতি-রাষ্ট্রগুলির পরস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়বে। দেশে দেশে বিভাজন ও খণ্ডিকরণের পরিবর্তে এক অখণ্ড ও অভিন্ন আর্থব্যবস্থার উদয় হবে। বিশ্বায়নের এই প্রক্রিয়া আসলে মুক্ত বাণিজ্য ও পণ্য লেনদেনের সীমান্তহীন অঞ্চল গড়ে তোলারই প্রক্রিয়া ('....a move towards a borderless regime of free trade and transaction...')।

আসলে অর্থনীতির বিশ্বজোড়া বিস্তৃতি হল বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক পরিসর যেখানে ভৌগোলিক পরিসরের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম।[৭]

তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের সাথে উদারীকরণের যোগসূত্র নিবিড়। এমনিতে উদারনীতিবাদ (liberalism) পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহায়ক শক্তি; এবং সমাজবাদের বিপরীতে এর অবস্থান। কমিউনিস্টরা মনে করেন, তথাকথিত উদারনৈতিকতা শ্রমের ওপর পুঁজির একচেটিয়া অধিকার কায়েমকে সমর্থন করে এবং পরোক্ষে পুঁজিবাদী শোষণের সহায়ক হয়ে ওঠে। বিশ্বায়ন সেই নবকলেবরপ্রাপ্ত উদারীকরণের নীতিকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে চলেছে। সোভিয়েত-পরবর্তী জমানায় এই আর্থিক উদারীকরণের তত্ত্বকে ব্যবহার করে কর্পোরেট বিশ্বায়নকে পূর্ণতা দিয়ে চলেছে আমেরিকাসহ পশ্চিমি পুঁজিবাদী শক্তিগুলি। উদার অর্থনীতির অভিঘাতে রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজ নিজ আর্থিক নীতি ও কৌশল পরিত্যাগ করতে একরকম বাধ্য হয়েছে ও তাদের রাষ্ট্রসত্ত্বার অস্তিত্ব ধরে রাখার প্রয়োজনে প্রবর্তন করে চলেছে ধারাবাহিক ভাবে আর্থিক সংস্কার। নয়া-উদারীকরণ (neo-liberalism) তাই বিশ্বায়নের অন্যতম সেরা হাতিয়ার, বাজারিকরণের অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি। উদারীকরণ ব্যতীত বিশ্বায়ন অসম্ভব।

চতুর্থত, বিশ্বায়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত উদ্যোগটি হল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সুস্থিতিকরণ ও প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস। অর্থনীতির মৌলিক নিয়ম মেনে বিশ্বায়ন ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট। মনে রাখতে হবে বিশ্বব্যাপী যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্য দিয়ে আর্থিক সুস্থিতিকরণ আসে। বিশ্বায়নপন্থীদের মতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের অর্থ হল রাষ্ট্রের মান্ধাতা আমলের নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর নিয়মকানুন থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংগঠনগুলিকে মুক্ত করা। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বায়নের শর্ত মেনে কাঠামোগত পরিবর্তনে বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বেসরকারিকরণের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হল। যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রশাসনের আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটানো বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত।

পঞ্চমত, বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক সংহতিকরণের সাথে সাথে শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, সংস্কৃতি, পরিবেশ সচেতনতা সহ সব ক্ষেত্রেই বিশ্বায়িত পরিচালন ব্যবস্থা বা global management-এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। আজকের তথ্যনির্ভর ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ (knowledge society) ও বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বায়নের একটি সুফল অস্বীকার করা যায় না, সেটি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ও উৎকর্ষবৃদ্ধি। কমপিউটারের আবিষ্কার থেকে প্রযুক্তির

জগতে যে অগ্রগতির শুরু ইন্টারনেট, সেল ফোন, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ডিজিটাল প্রযুক্তির হাত ধরে তা নতুন নতুন বিস্ময়ের সামনে বিশ্ববাসীকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। অবধারিতভাবে ঘটে চলেছে যোগাযোগের অগ্রগতি এবং বিশ্ব যথার্থই পরিণত হয়েছে বিশ্ব গ্রামে। দেশে দেশে ভৌগোলিক দূরত্ব আজ সম্পর্ক স্থাপনে কোনোরূপ বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো আবিষ্কার আজ নিমেষে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বায়ন বদলে দিয়েছে সম্পদের সংজ্ঞা-র পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বকে।

ষষ্ঠত, বিশ্বায়নের প্রবক্তারা বলে থাকেন যে বিশ্বায়নের দরুন রাষ্ট্রের কাজের পরিধির সংকোচন ঘটলেও তা জনগণের দুরবস্থা কিংবা দুর্ভাবনার কারণ হবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলুপ্তিসাধনের সমান্তরাল পথে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়বে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির সুফল ভোগ করবে সব দেশের মানুষ। এর ফলে বিশ্বের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হবে এবং বাজার অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের সূত্র ধরে সর্বত্রই মানুষের রুজিরোজগারের সুযোগ বাড়তে থাকবে। কিন্তু এই উন্নততর পরিস্থিতির জন্যে প্রাথমিকভাবে মানুষকে ত্যাগস্বীকার করতে হতে পারে। কেননা মুক্ত অর্থনীতিতে পুঁজির বিশ্বায়ন যেসব প্রয়োজনীয় সংস্কার আনছে তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল দেশি-বিদেশি-বেসরকারি পুঁজি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যতদূর সম্ভব হ্রাস করা। এই সূত্রধরে মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়ে আনতে হবে এবং মুদ্রার যোগান নিশ্চিত করতে প্রধানত সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর দরুন গোড়াতে ভর্তুকি কমতে পারে এবং জনকল্যাণখাতে ব্যয় হ্রাস পেতে পারে এবং সাময়িকভাবে কয়েকটি দেশে বেকারি ও দারিদ্র্য বাড়তে পারে। কিন্তু পরিণামে সংশ্লিষ্ট সংস্কারসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে অর্থনীতি।

সপ্তমত, বিশ্বায়নের বিরোধীরা মনে করেন এই এক-মেরু বিশ্বের মতো বিশ্বায়নও একমুখি ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। দরিদ্র বিশ্ব অর্থাৎ তৃতীয় দুনিয়ার জনসাধারণের নিকট এই বিশ্বায়ন আশীর্বাদ নয়, অভিশাপরূপে হাজির হয়েছে। কেননা, এই বিশ্বায়নী প্রক্রিয়ায় দুনিয়াকে একসূত্রে বেঁধে ফেলার যে প্রয়াস চলছে তা ধনতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থার স্বার্থে, আমজনতার কল্যাণের লক্ষ্যে নয়। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে ধনী দেশগুলি তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নততর প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও পরিকাঠামো ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করছে তার সুফল তারাই আত্মসাৎ করছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উন্নয়শীল দেশগুলির বাজার তারা দখল করছে কিন্তু ঐ সব দেশের পিছিয়েপড়া দেশের মানুষের আর্থিক সুবিধার প্রয়োজনে তারা কাজে লাগছে না। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের পণ্যসামগ্রী উৎপাদকরা প্রতিযোগিতায় কোনো ভাবেই

এঁটে উঠতে পারছে না। পরিণতিতে পশ্চাদপদ দেশগুলিতে হাজার হাজার ছোটো ও মাঝারি শিল্প, কলকারখানা, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় শিল্পোদ্যোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং কাজ হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। মুনাফালোভী বহুজাতিক সংস্থা ও শিল্পগোষ্ঠীগুলি বিশ্বায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলিকে তাদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

অন্যদিকে, বিশ্বায়ন যেভাবে জাতি-রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ধ্বংস করে চলেছে তার পরিণতি হয়ে উঠছে ভয়াবহ। civil society বা নাগরিক সমাজের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কোনোভাবেই কল্যাণকর হতে পারে না। দেশে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্র ও সরকারসমূহের ভূমিকা অবহেলার বিষয় নয়। বিশ্বায়ন সেই কাজটাই করে চলেছে। এই নয়া ব্যবস্থার সমালোচকরা আরো বলে থাকেন যে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় যেভাবে কল্যাণকর অর্থনীতি (welfare economy) ব্রাত্য হয়ে পড়ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বাজার অর্থনীতি (market economy) তা তৃতীয় বিশ্বের ভর্তুকি ও অনুদানপ্রাপ্ত এবং পিছিয়েপড়া জনগণের আর্থিক দুর্দশা বাড়িয়ে চলেছে এবং দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছে। স্বভাবতই সেই অমোঘ প্রশ্নগুলি বার বার উঠে আসছে বিশ্বায়ন কার স্বার্থে? বিশ্বায়নের কাঠামোয় পুঁজির অবাধ চলাচল কিসের স্বার্থে? মুক্ত অর্থনীতি যা আসলে বাজারসর্বস্ব অর্থনীতি তা কার প্রয়োজনে? উদারীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ কোন্ শ্রেণির কল্যাণের লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল?

এইসব নানা রূপ, নানা বৈশিষ্ট্য, অজস্র বিপরীতধর্মীতা ও পরস্পর বিরোধিতা নিয়েই বিশ্বায়ন। নিরপেক্ষভাবে বললে, বিশ্বায়ন এমন এক প্রক্রিয়া যার আবির্ভাব হঠাৎ করে একদিনে ঘটেনি। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এক অনিবার্য বিবর্তনের পরিণতি বিশ্বায়ন। মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও রূপান্তর, জ্ঞানভাণ্ডারের নতুনতর উন্মোচন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগমন, এসব কিছুর সমন্বয়ী পর্যায়ক্রমিক আদিকল্প—বিশ্বায়ন। এই বিষয়টি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত 'Bound Together' (ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৭) শীর্ষক গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানী নয়ন চন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। শ্রী চন্দ সিদ্ধান্তে এসেছেন, বিশ্বায়ন বা ভুবনায়ন এমন এক অনিবার্য ভবিতব্য যাকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই, ছিল না। তাঁর মতে বিশ্বায়ন যেমন কোনো দেশ, কোনো শক্তির একক ও সচেতন প্রচেষ্টায় ঘটেনি তাই এর ফল ক্ষতিকর হলেও বিশেষভাবে কাউকে দায়ী করা যায় না। বিশ্বায়নের সঙ্গে মানিয়ে চলার একমাত্র পথ হল প্রতিটি দেশ বা রাষ্ট্রকে তার নিজের মতো করে নিজস্বতা-নির্ভর উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে এই প্রক্রিয়া বা উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে। এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় বিশ্বায়নপন্থী ধনী পশ্চিমি পুঁজিবাদী দেশগুলির ভূমিকা নিয়ে, তাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে।